একক ৪৬ ❐ কৃষক বিদ্রোহ, গণ-অভ্যুত্থান ও উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ

গঠন ঃ

৪৬.০ উদ্দেশ্য
৪৬.১ প্রস্তাবনা
৪৬.২ কৃষক বিদ্রোহ
৪৬.৩ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ
৪৬.৩.১ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিদ্রোহ
৪৬.৩.২ নায়েক বিদ্রোহ
৪৬.৪ উপজাতি বিদ্রোহ
৪৬.৪.১ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ধলভূম
৪৬.৪.২ ময়মনসিংহ
৪৬.৪.৩ পশ্চিমভারত
৪৬.৪.৪ ছোটনাগপুর
৪৬.৪.৫ উত্তর-পূর্ব ভারত
৪৬.৫ ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন
৪৬.৫.১ কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের গুরুত্ব
৪৬.৬ সারাংশ
৪৬.৭ অনুশীলনী
৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস।
- সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ঘটনা।
- উপজাতিদের দ্বারা ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
- ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের কথা।

৪৬.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে আগের এককের যুক্তিকে আরও প্রসারিত করে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপকতার অসন্তোষকে তুলে ধরা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রক্রিয়া থেকে ভারতীয় জনসাধারণের কোনও অংশই রেহাই পায়নি। কৃষক, উপজাতি ও অন্যান্য অনেকেই তাই এই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বর্তমান একক এই প্রতিরোধের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে।

৪৬.২ কৃষক বিদ্রোহ

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক কৃষি-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এইসব বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হ'লে কেবলমাত্র এদেশে কোম্পানির শাসনের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ের বহুসংখ্যক কৃষি-বিদ্রোহের ইতিহাস স্মরণ করতে হবে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে কৃষি-সঙ্কট ও কৃষি-বিদ্রোহ ছিল বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। এই সমস্ত বিদ্রোহে স্থানীয় ভূস্বামীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বহু জায়গায় কৃষি-বিদ্রোহর নেতৃত্বে ছিল তারা। সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপেরপ বোঝা মেটাতে কৃষকদদের কাছ থেছকে কর নিড়ে নেওয়া হ'ত। ফলে, জমি ছেড়ে কৃষকরা হয় পালিয়ে যেত নয় পরিস্থিতির চাপে পড়ে মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াত। প্রযুক্তিগত উন্নতিরি অভাবে মুঘল যুগে চাষকার্যে পূর্বের তুলনায় অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর্বে রাজনৈতিক নৈরাজ্যের প্রাদুর্ভাবে এদেশে কৃষিব্যবস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইস্টি ইন্টিয়া কোম্পানি এই পরিস্থিতিতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের সমস্যা প্রথ থেকে কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বভারতে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম যে সব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তার মূলে ছিল কোম্পানির প্রশাসনিক রদবদল। উদাহরণস্বরূপ সন্দীপ (১৭৬০), রংপুর (১৭৮০), বীরভূম (১৭৮৮-৯০) এবং খুর্দা (১৮১৭) অঞ্চলের বিদ্রোহগুলি উল্লেখ করা যায়। গোকুল ঘোষাল নামে এক নুন ব্যবসায়ীকে সন্দীপ দ্বীপ জরিপ করে খাজনার হার নির্ধারনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুযোগ বুঝে এলাকার প্রাচীন ভূস্বামী পরিবারের কিছু অংশ দখল করে তিনি সেখানে নুনের একচেটিয়া কারবার চালু করার চেষ্টা করেন। বিদ্রোহের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা খর্ব হয়। ইদ্রাকপুর এবং রংপুরে সাময়িক খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে দেবী সিংহ যে স্থানে অনেক ছোট ও বড় জমিদারকে উৎখাত করে কৃষকদের খাজনার হার অত্যন্ত বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহের পর ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর কিছু অন্যায়ের প্রতিার করা হয়। বীরভূমের বিদ্রোহ ছিল সেখানকার রাজস্ব সংগ্রাহক কিটিংয়ের খাজনা বৃদ্ধির (১৭৮৬-৮৭) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরিণামে সমগ্র বাংলার কৃষিব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও বীরভূম অঞ্চলে বহিরাগত কৃষি-শ্রমকদের সহজ শর্তে আকৃষ্ট করে সেখানকার কৃষক এবং গ্রামপ্রধানরা ক্ষতির পরিমাণ অনেককটা কম করতে পেরেছিল। ১৭৮৬ সালে বীরভূমের কালেকটার কর্নেল কীটিঙের খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে

সেখানকার কৃষকরা রাষ্ট্রকে কোনওরূপ কর দিতে অস্বীকার করে। বীরভূম রাজ্যের কর্মচ্যুত সেনারা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাদের সমর্থন জানায়। এই বিদ্রোহও সফল হয়নি।

খুর্দার রাজার দেওয়ান জগবন্ধুকে প্রতারিত করে কোম্পানি তার জমি বিক্রি করে। প্রতিবেশী অন্যান্য জমিদারের ভূসম্পত্তিও নীলামে তোলার ব্যবস্থা করে। ক্ষুব্ধ হয়ে তার জগবন্ধুকে সমর্থন জানায়। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে উড়িষ্যার জনগণের আর্থিক দুর্দশার সীা ছিল না। নুনের দাম হঠাৎ বেড়ে যাও গ়য় বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত কড়িপর মূল্য হ্রাস পায়। উপরন্তু, শস্যবাণিজ্যে মন্দা দেখা দেওয়ায় উড়িষ্যার প্রজদারা আর্থিকভাবে আরও বিপন্ন বোধ করে। কয়েক জায়গায় আবাসিক কৃষকদের জমির খাজনা সেইসঙ্গো বৃদ্ধি পেতে থাকে। উড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহ দমন করতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪৬.৩ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ

আঠার শতকের শেষদিকে বাংলা ও বিহারে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বাংলার গ্রামসমাজ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" উপন্যাসে পাঠক সে দৃশ্যের সঙ্গো পরিচিতন হন। কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের কোনওরূপ চিন্তা না করে কোম্পানির সরকার কড়ায়গণ্ডায় খাজনা আদায়ে বন্ধপরিকর ছিল। এই অবস্থায় উত্তরবঙ্গো বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠছক ও মজনু শাহ। তাঁদের সঙ্গো যোগ দেন চেরাগ আলি ও দেবী চৌধুরানী। সন্ন্যসী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) শোষিত কৃষক সমাজ, (২) মুঘল সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পর বেকার সৈনিক এবং (৩) সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়, যারা বছরের অধিকাংশ সময় কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর বর্ষাকাল শুরু হওয়া পর্যন্ত তারা উত্তর ও পূর্ববঙ্গোর বিস্তৃত এলাকা ছারখার করে। ইংরেজ সূত্র থেকে জানা যায়, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহীরে সংখ্যা একসময় প্রায় ৫০,০০০ দাঁড়ায়। তীর্থযাত্রীদের ওপর কর আরোপ এবং কোম্পানির অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা তারা কাজে লাগায়, বিদ্রোহীদের সঙ্গো সংঘর্ষে সরকারি বাহিনী বারাবর পর্যুদস্ত হয়। ১৭৮৭ সালে ভবানী পাঠক যুদ্ধে প্রাণ দেন। এরপরে মজনু শাহের মৃত্যু হয়। ক্রমে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪৬.৩.১ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিদ্রোহ

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কৃষক বিদ্রোহের কথাও এই প্রসঙ্গো উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণভারতে সমাজের প্রভাবশালী অংশকে পাশে পেতে তাদের মধ্যে ইনাম বিতরণ করেন স্যার টমাস মানরো। তিনি তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গভর্নর (১৮২০-২৭)। এই কারণে সেখানে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। মালাবার উপকূলে জমির অধিকার নিয়ে প্রভাবশালী নায়ার এবং নাম্বুদ্রিগোষ্ঠীর সঙ্গো মোপলাদের বহুসংখ্যক সংঘর্ষের কথা আমরা পড়ি। ১৮০২ সালে উন্নি মুখ মুপ্পান নামে জনৈক মোপলা নেতা বিদ্রোহ ঘোষমআ করেন। তাঁর এক ভাইকে কোম্পানি সরকার ১৭৯৯ সালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। বিদ্রোহের আর এক নেতা আতান গুরুক্কালকে রাজস্ব তছরূপের অভিযোগে কোম্পানি সরকার কারাগারে

নিক্ষিপ্ত করেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেন। মোপলারা ছিল দরিদ্র ধীবর কিংবা কৃষিকাজে নিযুক্ত সামান্য উপায়ের কৃষকমাত্র। ইংরেজ শানস প্রতিষ্ঠার পূর্বে মালাবার উপকূল যখন মহীশূর রাজ্যের শাষনাধীন ছিল, টিপু সুলতান জমিতে তাদের প্রতিষ্টা দিয়েছিলেন। ইংরেজ শআসন কায়েম হবার পর তারা সেই সুযোগ হারায়। মোপলা বিদ্রোহকে কিন্তু ঐতিহাসিকরা ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখাতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে তার মূল নিহিত ছিল বাস্তবের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়।

৪৬.৩.২ নায়েক বিদ্রোহ

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত কতকগুলি বিশেষ সম্প্রদায় সরকারের কাছ থেকে নিষ্কর জমি লাভ করত। ইংরেজ সরকার সেগুলির বিলুপ্তি ঘোষণা করার স্থানে স্থানে বিদ্রোহে সূচনা হয়েছিল। উদাহরণত, ১৮০৬-১৬ সালের মধ্যে মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহের উল্লেখ করা যেতে পারে। নায়েক সম্প্রদায়ের নিষ্কর জমি কেড়ে নিয়ে কোম্পানির সরকার তাদের কাছে খাজনা দাবী করে। বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করা হয়। মারাঠা রাজ্যে দুর্গ প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত গাডকারি সম্প্রদায় ১৮৪৪ সালে বিদ্রোহ করে সাতারায় ভূমিব্যবস্থা নতুন করে নির্ধারণ করা কালে কোম্পানি তাদের নিষ্কর জমির দখল নেয়। গাডকারি সম্প্রদায় এই ঘটনায় প্রচণ্ড বিরোদিতা করে। ১৮৫২ সালে খান্দেশ অঞ্চলের কৃষকেরা বলপূর্বক জমি জরিপের কাজে বাধা দিয়েছিল। ইংরেজড শাসন প্রতি্ঠার আগে মহারাষ্ট্রের পুলিশের নিম্নপদে নিযুক্ত পার্বত্য রামোশি সম্প্রদায়কে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রচুর পরিমাণে জমি দান করে সন্তুষ্ট রেখেছিল।

৪৬.৪ উপজাতি বিদ্রোহ

কোম্পানির সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতি বিদ্রোহ স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। এর মূলে ছিল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একদিকে ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবত৪ন এবং অন্যদিকে উন্নততর ও অধিক প্রভাবশালী বহিরাগত গোষ্ঠীর মানুষের হস্তক্ষেপ। উপজাতি সমাজ এ পর্যন্ত বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছিল। তাদের জীবনযাত্রার নিজস্ব ধরন ছিল। ইংরেজ শাসন এদেশে প্রসারলাভ করার ফলে ক্রমশ উপজাতি সমাজের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়। এর একটি প্রাথমিক নিদর্শন চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ১৭৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিকারের পর সেখানকার তুলোর ওপর খআজনা আদায়ের দায়ি্তব দালালদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক অর্থ তারা আদায় করে। ১৭৭৬ এবং ১৭৮২ সালে চাকমা সম্প্রদায়ের বাধাদানের ফলস্বরূপ ১৭৮৯ সালে সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় যে, তুলা উৎপাদনকারী এলাকা থেকে গ্রামপ্রধানরা নির্ধারিত অর্থ প্রদান করলে তুলো কর আর আরোপ করা হবে না।

৪৬.৪.১ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ধলভূম

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ধলভূম অঞ্চলকে সেকালে জঙ্গালমহল বলা হ'ত। ১৭৬৮ সালে ধলভূ মের রাজা জগন্নাথ সিং বর্ধিত হাতে কোম্পানির খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। স্থানীয় সমস্ত জমিদার

ও প্রজাবৃন্দ তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহে একজোট হয়। প্রায় পাঁচ হাজার চুয়াড় বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। মেদিনুপীরের স্থানীয় রাজাদের পাইকরা চুড়ায় নামে পরিচিত ছিল। কোম্পানির বাহিনীকে তারা প্রথমে পরাজিত করে। জগন্নাথ তাঁর জমিদারী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। ১৭৭১, ১৭৮৩-৮৪ এবং ১৭৮৯-৯০ সালে চায়াড়রা ফের বিদ্রোহী হয়। তবে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাদের ১৭৯৮-৯৯ সালের বিদ্রোহ। মেদিনীপুরের কালেক্টরের লেখা ২৫শে মে, ১৭৯৮ সালের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে যারা জমি ভোগদখল করছিল, কোম্পানি সরকার তাদের ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং অকারণে কোনওরূপ অপরাধ না করা সত্ত্বেও তাদের জমি কেড়ে নেয়। আবেদন-নিবদেদনের পথে এই সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় চুড়ায়ড়া শেষপর্যন্ত বিদ্রোহে সামিল হয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন দুর্জন সিং। কোম্পানি সরকার তাঁকে তাঁর জমি থেকে উৎখাত করেছিল। একদিকে দমন-পীড়ন এবং অন্যদিকে বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচুর অর্থ ছড়িয়ে সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়।

৪৬.৪.২ ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর জমিদারী তখন বিভিন্ন অংশীদার নিয়ে গঠিত। এর একটি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। একদিকে পরস্পরের বিরোধিতা করে শক্তি ক্ষয় করে, অন্যদিকে সরকারের খাজনার পরিমাণ তারা কম করে দেখায়। আবার সেই কৃষকদের কাছ থেকে তারা অবৈধ বহু অর্থ আদায় করত জমিদারীর খরচ বা আবওয়াহব হিসেবে। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুচ্ছ চলাকালে (১৮২৪-২৬) সরকার সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে সেখানকরা জমিদারদের উপর নানাপ্রকার চাপ সৃষ্টি করে। সৈন্যবাহিনীর চলাচলের উদ্দেশ্যে দ্রুত সড়ক ও নৌকা নির্মাণের জন্য কারিগরের প্রয়োজন হয়। জমিদাররা সরকারের দাবী পূরণ করতে প্রজাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে। কারবাড়ীর জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ মনমনসিংহ জেলার উত্তরে পার্বত্যবাসী গারো এবং হাজংদের শেরপুরের স্থানীয় বাজারে আসার পথ বন্ধ করে দেন। শেরপুরের উপত্যকা অঢ্চলের মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে এইসব পার্বত্যবাসীরা জোটচ বাঁধে। নতুন একধরনের ধর্মবিশ্বাস এই সময়ে গারেপা ও হাজংদের মধ্যে প্রচারিত হয়। করিমশাহ নামে এক মুসলমান ফকির ও তাঁর পুত্র টিপু এবং তাঁর অনুগামীরা পাগলপন্থী নামে ধর্মীয় সংগঠনে অভিহিত হ.। ১৮২৫ সালের শুরুতে পাগলপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রচলিত রীতিনীতি থেকে তাদের জীবনযাত্রা এত ভিন্ন ছিল যে, তাদের 'পাগগল' বলা হ'ত। গুরুর আশীর্বাদে পাগলপন্থীরা নিজেদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অপরাজেয় জ্ঞান করত। সরকারের পতন আসন্ন ভেবে তারা বিদ্রোহী হয়। সরকার তাদের অচিরেই দমন করতে পারলেও ১৮৩৩ সালে বিদ্রোহের আগুন তাদের মধ্যে আবার প্রজ্জ্বলিত হয়। আগের মতো নেতারা এবার দৈবশক্তির ওপর নির্ভর ছিল না। সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গারো পাহাড় সংলগ্ন আসামের কোনও কোনও অঞ্চল থেকে পাগলপন্থীরা বেশ কিছুটা সমর্থন লাভ করেছিল। সরকার-বিরোধী প্রায় তিন হাজার পাগলপন্থী সামিল হয়েছিল কিন্তু এবারও অল্পদিনের মধ্যেই সরকারি বাহিনীর কাছে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

৪৬.৪.৩ পশ্চিম ভারত

১৮১৭-১৮ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের প্রাক্কালে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের এক

গুরুত্বপূর্ণ অমাত্য ত্রিম্বকজী ডাঙ্‌লে আদিবাসী ভীলদের মনে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন। ১৮২৫ সালে রামোসী সম্প্রদায় কোন্‌পানির কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ১৮২৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে ভীল বিদ্রোহ ঘটে। ভীলরা প্রধানত খান্দেশ অঞ্চলে বসবাস করত। ১৮১৮ সালে এই অঞ্চল ইংরেজরা অধিকার করার পর ভীলরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮২৭ সালে কর্নেল আউটরাম ভীল বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়েছিলেন। বিক্ষিপ্তভাবে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ভীলরা তবু লড়াই চালিয়েছিল।

পশ্চিমঘাট ও কচ্ছের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী কোল উপজাতি সম্প্রদায় মারাঠা শাসনকালে দুর্গ রক্ষার কাজে নিযুক্ত হ'ত। কোম্পানি এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করার পর ১৮২৮ সালে রামোসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করে। সরকার এই বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমন করতে সক্ষম হ'লেও এক দশক পরে কোলরা পর্যন্ত কোলরা সরকারের সঙ্গে অমস লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য তাদের হার স্বীকার করতে হয়।

৪৬.৪.৪ ছোটনাগপুর

ছোটনাগপুর অঞ্চলের একালের ইতিহাস বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার কোল উপজাতিরা হো, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইংরেজ আমলে পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজা ও জমিদাররা কোল সম্প্রদায়ের বাসভূমি বা কোলহাম অঞ্চলের ওপরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৮২০ সালে পোড়াহাটের রাজা ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। পোড়াহাট একটি করদ রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। সেখানকার রাজার ওপর যে বিপুল করভার আরোপিত হয় তা মেটাতে তিনি হো-কোলদের অঢ়চলের ওপর কর্তৃত্ব দাবী করেন। কোম্পানি তার এই ইচ্ছা পুরণ করে, রাজকর্মরারীরা জোর করে হো-কোলদের কাছ থেকে খাজদনা আদায় করতে গিয়ে বিদ্রোহের সম্মুখীন হয় (১৮২০)। রাজা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। চাঁইবাসার কাছে কোলবাহিনী ইংরেজদের হাতে পরাজন বরণ করে। বনের আড়াল থেকে কোলরা আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে যায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৮৩১ সালে কোলরা আবার বিদ্রোহী হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে ইংরেজ শাসকরা কোলহাম অঢ়চলের শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে।

উনিশ শতকে সাঁওতাল বিদ্রোহ বারবার ঘটেছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর সাঁওতাল পরগণা জমিদারী এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সাঁওতালদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে জমির খাজনা আদায় করা হয়। পূর্বের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে তারা দমনে কোহ (বর্তমান রাজমহল পাহাড়তলি) এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অঞ্চল ছিল তখনকার ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। সাঁওতালরা আশা করেছিল নতুনভাবে এখানে তাদের পক্ষে জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু জমিদার, মহাজন, সরকারি আমরা এবং ব্যাপারীদের শোষণের হাত এখানেও বিস্তৃত হয়। ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ এবং ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে।

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব নামে চার ভাইয়ের নেতৃত্বে ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। ঐ বছর ৩০শে জুন ভগ্নাডিহিতে এক বিশাল জনসমাবেশে ৪০০৯ সাঁওতাল

গ্রাম থেকে দশ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল স্থানীয় কামার, কুমোর, তেলী, গোয়ালা, বাগদি, হাড়ি, ডোম, চামার প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা। মুসলমান মোি নরাও বিদ্রোহীদের সাহায্য করে। বিদ্রোহীদের রোষের প্রথম শিকার হন দীঘি থানার দারোগা অত্যাচারী মহেশ দত্তত। সাঁওতালদের কঠিন প্রতিরোধের সামনে শুরুতে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়। পরে তারা নৃশংসভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। ভাগলপুরের কাছে সম্মুখ সমরে চাদ ও ভৈরব প্রাণ দেন। সিধু ও কানুকে একজন বিশ্বাসঘাতক ধরিয়ে দিলে তাদের চরম দণ্ড বিধান করা হয়। বিদ্রোহীরা পরে ঐ বিশ্বাসঘাতকের প্রাণনাশ করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উলল্লখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সংবাদ আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা শালগাছের ডাল পাঠানোর যে উপায় উদ্ভাবন করে তাতে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পূর্বে অনুরূপ লক্ষ্যে চারপিাটি ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীরা বিশ্বাস করত ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাদের ওপর রয়েছে। পৃথিবী পাপে আচ্ছন্ন এবং তা থেকে মুক্তিবিধানের জন্য সিধু-কানুন আবির্ভাব ঘটেছে এমন ধারণাও সাঁওতালদের মনে বদ্ধমূল ছিল। তৃতীয়ত, সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরুতে জমিদার মহাজন-ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হ'লেও পরে তার গতিমুখ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ১৮৫৫-৫৬ সালের পর সাঁওতালরা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিহার করলেও শতাব্দীর শেষপর্যন্ত সাঁতোলরাজ গড়ার স্বপ্ন সাঁওতালরা উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত ত্যাগ করেনি। ১৮৬১-৬৫, ১৮৭১-৭২, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮১-৮২ সালে এই উদ্দেশ্যে তাদের আন্দোলন পরিচালিত হয়।

৪৬.৪.৫ উত্তর-পূর্ব ভারত

উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে কোম্পানির সংঘাত ঘটে। ব্রহ্মপুত্র এবং মুর্মা নদীর মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টায় কোম্পানির পরিদর্শকরা ১৮২৯ সালে খাসি জনগোষ্ঠীর রোষের শিকার হয়। ইংরেজরা তাদের দমন করে। পরবর্তী দু' দশকে সিংপো, নাগা প্রভৃতি আসামের উপজাতি গোষ্ঠীর ওপর কোম্পানির কর্তৃত্ব বিস্তৃত হয়।

৪৬.৫ ইসলামী পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন

পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলির প্রতি এরপর আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আরবদেশে মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৯২) যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন ভারতবের্ষর বুকেও তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২২-২৩ সালে রায়বেরিলির সৈয়দ আহমত (১৬৮৬-১৮৩১) মক্কা ও মদিনা ভ্রমণকালে তাঁর সংস্পর্শে আসেন। ভারতে তিনি ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবক্তা। ইসলাম ধর্মকে যাবতীয় বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে কোরানের মূল বাণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। ওয়াহাবিরা তারিকা-ই-মোহাম্মদীয়া নামে ধর্মসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। সৈয়দ আহমদ প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ াকরেন। উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে সিখদের পরাস্ত করে তিনি ১৮২৭ সালে "ইমাম" মর্যাদায় ভূষিত হন। তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শি্য বিলায়েত আলি ও ইমায়েৎ আলি যথাক্রমে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সালের

মহাবিদ্রোহের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু ওয়াহাবি নেতা যুক্ত ছিলেন। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ওয়াহাবিদের ইংরেজবিরোধিতার ছেদ পড়েনি। কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে তারা এই প্রথম সচেতনভাবে সরকারে বিরুদ্ধে অসন্তোষের বীজ বপন করে।

ওয়াহাবি আন্দোলনের একটি ধারা বাংলায় তিতুমীরের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ২৪ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে তিতুমীর জন্মেছিলেন ১৭৮২ সালে। হজ করতে গিয়ে ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় সৈয়দ আহমদের সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। গ্রামে ফিরে এসে তিনি যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তা ক্রমশ হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। অন্যান জমিদাররা তাঁকে সমর্থন জানান। নারকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তাঁর ঘাঁটি গড়ে তোলেন। এখানে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মিত হয়েছিল। তিতুমীরের সেনাপতি ছিলেন শেখ গোলাম মামুম। ১৮১৩ সালে উনিশে নভেম্বর তিতুমীর ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী যুদ্ধে মারা যান। অন্য কয়েকজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ইংরেজ সরাকরের সশস্ত্র হস্তক্ষেপে তিতুমীরের বিদ্রোহ ধ্বংস হয়।

উনিশ শতকের বাংলাদেশের ফরাজী আন্দোলন দীর্ঘদিন চলেছিল। "ফরায়েজ" একটি আরবী শব্দ (বহুবচনে "ফরজ")। ফরায়েজী সব্দের অর্থ হল ইসলাম নির্দিষ্ট "বাধ্যতামূলক কর্তব্য"। এই আন্দোলনের প্রথম পথনির্দেশক হাজি শরিয়তুল্লা (১৭৮১-১৮৪০)। ফরিদপুর অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। হাজি শরিয়তউল্লা (১৭৮১-১৮৪০) ফরিদপুরের বিস্তৃত অঞ্চলের জনসাধারণকে এই আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এই কারণে এটিকে সংস্কার আন্দোলন বলা হয়।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হিন্দু জমিদাররা প্রজাসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন পূজা-পার্বণের জন্য চাঁদা আদায় করতেন। কিন্তু হাজি শরিয়তউল্লা হিন্দু জমিদারদের পূজা-পার্বণে চাঁদা দেওয়া নিষিদ্ধ করেন। এই কারণেই তাঁর আন্দোলন জমিদার-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করে।

হাজি শরিয়চতউল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোহসেনউদ্দীন দুদু মিয়াঁ (১৮৪৯-৬২) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনের তিনটি ধারা লক্ষ্যণীয় : (১) জমিদার-নীলকরদের অন্যায় জুলুম প্রতিরোধ করা, (২) হিন্দু সমাজের অনুযকরণে মুসলিমদের ভেতর সামাজিক বৈষম্য দূর করা, (৩) যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, সেহেতু জমির ওপর চাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই দাবিগুলো আদায় করতে গিয়ে ফরায়েজীদের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ললড়তে হয়েছিল। দুদু মিয়াঁ একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনিক কাঠামো নির্মাণ করেন— "যা ফরাজেয়ী খেলাফৎ"নামে পরিচিত। সমগ্র পূর্ববঙ্গাকে তিনি কয়েকটি অঞ্চচলে বিভক্ত করে প্রতিটি অচলের দায়িত্ব একজন প্রতিনিধি বা খলিফার হাতে ন্যস্ত করেন। সরকারি আদালত বর্জন করে ফরায়েজীরা নিজেদের বিরোধ পঞ্চায়েত মাধ্যমে মিটিয়ে নিতেন. ১৮৪০খ্রিস্টাব্দ থেকে ফরায়েজী আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে। দুদু মিয়াঁ সব মানুষকে সমান জ্ঞান করতেন। তাঁর নেতৃত্বে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জমিদরা ও ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকরা জোট বাঁধে।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে মিত্রতার সমর্থকদরে সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ জন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ দুদু

৪৯.৮.১ কৃষক আৰু জনজাতীয় বিদ্ৰোহৰ প্ৰকৃতি

(Primary resistance)

৪৯.৯ সাৰাংশ

কৃষিব্যবস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাসনভার গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের সমস্যার দিকে নজর দেয়। পূর্বভারতে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম যে সব বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তার মূলে ছিল প্রশাসনিক রদবদরল। উদাহরণস্বরূপ, সন্দীপ, রংপুর, বীরভূম এবং খুর্দার বিদ্রোহের উল্লেখ করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তর এবং পূর্ব বাংলায় ও বিহারেপ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "আনন্দমঠ" গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কোম্পানির অপশাসনের বিরদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ ছিল বিদ্রোহীরা তা কাজে লাগায়।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কৃষক বিদ্রোহের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮০২ সালে মালাবার উপকূলে মোপলা বিদ্রোহ ঘটে। মোপলারা ছিল দরিদ্র ধীবর কিংবা কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষক। মোপলা বিদ্রোহ মূলত ছিল আর্থসামাজিক কাঠামেরা পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ। ১৮০৬-১৬ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে নায়েক বিদ্রোহ হয়। মারাঠা রাজ্যে গাডকতারি সম্প্রাদায় ১৮৪৪ সালে বিদ্রোহ করে। ১৮৪২ সালে খান্দেশ অঞ্চলের কৃষকরা বলপূর্বক জমি জরিপের কাজে বাধা দিয়েছিল।

উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একদিকে ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অন্যদিকে উন্নততর ও অধিক প্রভাবশালী বহিরাগত গোষ্ঠীর মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে উপজাতি সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৭৭৬ এবং ১৭৮২ সালে চাকমা সম্প্রাদয় তুলোর উপর কর আরোপে বাধা দেয়। ১৭৬৮, ১৭৭১, ১৭৮৩-৮৪ এবং ১৭৮৯-৯০ সালে চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ১৭৯৮-৯৯ সালের বিদ্রোহ। ময়মনসিংহ ও ১৮২৫ সালে পাগলপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পশ্চিমভারতে ১৮২৫ সালে রামোসী সম্প্রদায় কোম্পানির কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ১৮২৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। একই সময়ে ভীল বিদ্রোহ ঘটে। পশ্চিমঘাট ও কচ্ছের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী কোল উপজাতি ১৮২৮ সালে রামোসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করে।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের কোলরা ইংরেজ ও স্থানীয় রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮২০ এবং ১৮৩১ সালে বিদ্রোহ করে। উনিশ শতকে বারবার সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল। জমিদার, মহাজন, সরকারি আমলা এবং ব্যাপারীদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ এবং ১৮৫৪-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮৫৫-৫৬ সালের বিদ্রোহ। এরপরও ১৮৬১, ৬৫, ১৮৭১-৭২, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮১-৮২ সালেও আন্দোলন অব্যাহত ছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতেও বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে কোম্পানির সংঘাত ঘটে।

আরবেশে মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তা। ভারতে রায়বেরিলির সৈয়দ আহমত ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবক্তা। ইসলাম ধর্মকে যাবতীয় বিচত্যুতি ওখে মুক্ত করে কোরানের মূল বাণীর পুনঃপ্রতিষ্টা ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ওয়াহাবি নেতা যুক্ত ছিলেন। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত ওয়াহাবিদের ইংরেজ-বিরোধিতায় ছেদ পড়েনি। ওয়াহাবি আন্দোলনের একটি ধারা বাংলায় তিতুমীরের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের বাংলায় ফরাজী আন্দোলনের পথনির্দেশক হাজি শরিয়তুল্লা। এই

আনেদ্‌লনের চরিত্র ছিল জমিদার-বিরোধী। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

কোম্পানির ভারত শাসনের একশ বছরের ইতিহাসে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ বিশেষ তাৎর্যপূর্ণ। এই বিদ্রোহগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক কারণে উদ্ভূত হ'লেও দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিতে এগুলি সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

৪৬.৭ অনুশীলনী

১। ১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যায়ে ভারতে কৃষক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন।

২। কোম্পানির আমলে ভারতবর্ষে উপজাতি বিদ্রোহ বিষয়ে নিবন্ধ আলোচনা করুন।

৩। ভারতে উনিশ শতকে মৌলবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য বর্ণনা করেন। আপনি কি এরূপ কিছু আন্দোলনের বর্ণনা দিতে পারেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ বলতে কি বোঝেন?

২। টীকা লিখুন : (ক) চুড়াড় বিদ্রোহ, (খ) সাঁওতাল বিদ্রোহ, (গ) পাগলপন্থী আন্দোলন, (ঘ) তিতুমীর (ঙ) শরিয়তুল্লা ও দুদু মিয়াঁ।

৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।

২। বিনয়ভূষণ চৌধুরী : "ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন (১৮২৪-১৯০০)", গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান।